০৮-০৩-১৮ : প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন।

"মিষ্টি বাচ্চারা - অতি প্রিয় থেকেও প্রিয়তম বাবার যথার্থ পরিচয় কিভাবে জানানো যায়, সেই যুক্তিই বের কর। নিখুঁত সঠিক বাক্যে আল্ফ্ বা আল্লাহ্-র পরিচয় দিতে পারলে, সর্বব্যাপীর ব্যাপারটাই সমাপ্ত হয়ে যাবে"

প্রশ্ন :- অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের চয়ন করা বাচ্চাদের কি এমন দ্বায়িত্ব ও কর্তব্য ?

উত্তর :- জ্ঞানের প্রতিটি পয়েন্টের উপরেই খুব ভাল রীতিতে সর্বদিক বিচার সাগর মন্থন করে, এক ও একমাত্র এই বাবার সঠিক পরিচয় সবাইকে জানানো। তার সাথে সাথে এটাও জানাতে হবে, কে তাদের পুণ্যাত্মা বানান আর কে বানায় পাপাত্মা - তা তাদেরকে সঠিক উপায়ে বোঝানো বাচ্চাদেরই কর্তব্য। রাবণ-রাজ্যের ফল হানিকারক 'কুল-ফল' খেয়ে অসুস্থ হওয়া থেকে বাঁচিয়ে, তাদেরকে অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের চয়নে সাহায্য করা। যুক্তিযুক্ত ভিন্ন-ভিন্ন পদ্ধতিও বের করতে হবে সেবার জন্য। ঈশ্বরীয় সেবায় ব্যস্ত থাকতে পারলে, অপার খুশীও পাওয়া যায়।

গীত :- ওগো প্রিয় থেকেও
. প্রিয়তম আমার, তুমি এসো আমার
. কাছে এসো, আমার কাছে ..... !

ওঁম্ শান্তি! পরমপিতা পরমাত্মা বাবাকে সর্বদা রচয়িতা নামেই ডাকা হয়। লোকেরা বলে থাকে, পশু-পক্ষী, জন্তু-জানোয়ার, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি সবকিছুরই রচয়িতা তিনি। কিন্তু তাদেরকে বোঝাতে হবে, মানুষের কথা তো আগে শোনো ও ভাবো - পরমপিতা যিনি রচয়িতা, তিনি কিভাবে মনুষ্য সৃষ্টি-জগতের রচনা রচেন। এই মানুষেরাই ওনাকে বাবা সম্বোধনে ডাকতে থাকে, যখন তারা দুঃখ-কষ্টে পড়ে। সবাই তখন ঐ এক রচয়িতা বাবাকেই স্মরণ করে। অতএব প্রথমেই একথা বোঝাতে হবে যে, মনুষ্য সৃষ্টি-জগতের রচয়িতা কে ? সেই এক রচয়িতাই সবার বাবা। আলোচনার শুরুতে এ ভাবেই বাবার পরিচয় জানাতে হবে। কিন্তু যখন তা আত্মা-স্বরূপে আসবে তখন, না তো আত্মার না পরমাত্মা-বাবার অন্য কোনও পরিচয় থাকে। আর যদি তার মধ্যে "অহম্ আত্মা"- এই পরিচয়ের ভাব থাকে, তখন বুঝে নিও সে আসলে কার সন্তান। আসলে আমরা সবাই তো পরমপিতা পরমাত্মারই সন্তান। সেই এক ও একমাত্র বাবাই হলেন এসবের রচয়িতা। সে হিসেবে সর্বাগ্রে নিশ্চয় মনুষ্য সৃষ্টি-জগতেরই রচনা করবেন তিনি। আর ওনার রচিত সেই নতুন দুনিয়া যা হবে স্বর্গ-রাজ্য। যেহেতু তিনি বাবা, তাই স্বর্গ-রাজ্যই রচবেন তিনি। কারণ দুঃখ-কষ্টের কোনও রচনা বাবা রচবেন, এমনটা হতে পারে না কখনই। যেখানে আমরা বি.কে.-বাচ্চারা এমন বাবার সন্তান, যিনি স্বয়ং স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা। অতএব আমাদের সেই স্বর্গ-রাজ্যে যাওয়ার আগ্রহ থাকা উচিত - না কি পরমধামেই থেকে যাওয়া উচিত ? যা কিছুই হোক না কেন, অবিনাশী বিশ্ব-নাটকের এই বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে কর্ম-কর্তব্যের পার্ট করতে আসতে তো হবে সবাইকে। বিচার-সাগর মন্থনের এটা একটা সুন্দর যুক্তি। যখনই সময় পাবে, তখনই এই বিচার-সাগরই মন্থন করবে। সাধু-সন্ন্যাসী, গুরু-গোঁসাইরাও কেউ-ই যথার্থ রীতিতে বাবাকে জানে না। এই বাবা যখন রচয়িতা, তখন তো অবশ্যই স্বর্গ-রাজ্যই রচবেন তিনি। অন্য সব আত্মারা তখন নির্বাণ-ধামেই থাকবে। আত্মাদের পিতা পরমাত্মার এই নির্বাণ-ধামই সকল আত্মার প্রকৃত ঘর, যেখানে বাবাও স্বয়ং থাকেন তার বাচ্চাদের

সাথেই। বাচ্চারা, বেহদের সেই বাবার সাথেই বুদ্ধির যোগ (যোগ-সাধনা) স্থাপন করতেই তোমাদের পুরুষার্থ করতে হয়। বাবার সাথে যোগের যোগাযোগ না হওয়ার কারণেই, ধারণার অভাবে মানুষের দ্বারা পাপ-কর্ম হয়ে যায়, যার প্রভাব সরাসরি আত্মায় ময়লা-আবর্জনার প্রলেপ পড়ে। আর এই ময়লা-আবর্জনা প্রলেপের মূল কারণ বাবাকে স্মরণ না করা। ভগবান তো কেবল এক ও একমাত্র একজনই। যিনি প্রিয় থেকেও প্রিয়তম এবং স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা। যেখানে অপার সুখ। আর এখানে এত দুঃখ-কষ্ট হবার কারণেই লোকেরা ভগবানকে স্মরণ করে। যে কোনও বাবাই বাচ্চাদের জন্ম দেন, সুখ দেবার উদ্দেশ্যেই।

সত্যযুগ ও ত্রেতাকে বলা হয় সুখধাম। আর বর্তমান এই সময়কালটা কলিযুগ। এর পরেই আবার সত্যযুগ আসবে। অতএব বাবাকে তো এখন আসতেই হবে। এমন ধরণের বিষয়গুলিকে বিচার-সাগর মন্থন করে, তবেই কারওকে বোঝাতে বসবে। এখানে তো সরাসরি বাবার দ্বারাই বাবার পরিচয় পাও তোমরা। জাগতিক সাধারণ মানুষেরা সেই প্রিয় থেকেও প্রিয়তম বাবাকে জানেই না। আর তারা যখন বাবাকেই জানে না, তাই তো নিজেকেও ওনার বাচ্চা বলে মানতে পারে না। সেখানে আমরা এখন এই বাবাকে জানতে পেরেছি, তাই তো অতি অবশ্যই ওনাকে স্মরণ করতে হবে। যদিও উনি সব আত্মাদেরই অসীম-বেহদের বাবা। সেই নিরাকার বাবা-ই এই সাকার প্রজাপিতার (ব্রহ্মা) দ্বারা ওনার রচনা রচান। অর্থাৎ প্রজাপিতা ব্রহ্মা আর তার ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী বি.কে. বাচ্চাদের দ্বারা। প্রজাপিতা ব্রহ্মার বাবা অবশ্যই তবে পরমপিতাই হবে, যেহেতু পরমপিতাই এই মনুষ্য সৃষ্টি-জগতের সৃষ্টিকর্তা।

নতুন কেউ এলে, প্রথমেই তাকে বাবার সঠিক পরিচয় জানাতে হবে। আল্ফ বা আল্লাহ্ অর্থাৎ ভগবানকে মনে পড়লেই, অতি সহজেই সে সবকিছুই বুঝতে পারবে তখন। এই আল্ফকে না জেনে কেউ-ই ঠিক মতন কিছুই বুঝে উঠতে পারবে না। আর অন্য লোকেদেরও সেভাবেই ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে, যে যেভাবে সহজেই তা সঠিক বুঝতে পারবে, তখন তারাও ভাববে তোমরা বি.কে.-রা সঠিক কথাই বলছো। বেহদের বাবাই যে স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা, এমন কথা আর কেউ-ই এভাবে বোঝাতে পারে না। তেমনি আবার নরক-রাজ্যেরও রচয়িতাও অবশ্যই কেউ না কেউ তো হবেই। এই বাবা যেমন পবিত্র বনাবার কারিগর, তেমনি পতিত বানাবার কারিগরও অবশ্যই কেউ আছে। এই পয়েন্টের উপরেই খুব ভালভাবে সহজ-সরল পদ্ধতিতে পরিস্কার করে বোঝাতে হবে। বোঝাতে হবে- কে এই বাবা আর কেনই বা আমরা স্মরণ করি ওনাকে। বিকারী রাবণকে তো আর স্মরণ করা যায় না! কিন্তু, লোকেরা তো একেবারেই অজ্ঞানের ঘোর অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে, তাই না তো তারা পবিত্র বানাবার রাম-পরমাত্মাকে জানে, আর না জানে পতিত বানাবার কারিগর রাবণকে। এখানকার ফর্ম পূরণ করাবার পূর্বেই, তাদেরকে প্রথমেই বাবার সঠিক পরিচয় জানাতে হবে। অন্যরা কেই কোথায়ও এমন প্রশ্ন করতেই পারবে না, তোমরা যেখানে আত্মাধারী তবে তোমাদদের অর্থাৎ আত্মাদের বাবা কে ? আত্মা তো সব মনুষ্যরই থাকে। তাই তো জীব-আত্মা, পাপ-আত্মা, পুণ্য-আত্মা.... এভাবেই বলা হয়ে থাকে। পুণ্য-আত্মা বানাবার কারিগর এই বাবা, আর সেই আত্মাকেই আবার পাপ-আত্মা বানায় কে ? এই বিষয়টাকে ব্যাখ্যা করে বোঝানোটাও খুবই জরুরী। যে বাবা এমন সুন্দর স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা, আমরা আত্মাধারীরা সবাই যার বাচ্চা, সেই বাবাকে কি তোমরা জানো ? যেহেতু তিনি আমাদের বাবা, তাই অবশ্যই আমাদের জন্য পবিত্র দুনিয়াই বনিয়ে দেবেন তিনি। কিন্তু বর্তমান সময় কালটা পতিত দুনিয়ার, তাই তো লোকেরা পবিত্র বাবাকে ডাকতে থাকে-

"পতিত পাবন বাবা তুমি এসো"। এত সব পতিত মনুষ্যদের পবিত্র কে বানায় ? আর পরমাত্মা যদি সর্বব্যাপীই বিরাজমান হন, তবে তো সেই প্রশ্ন উঠতেই পারে না, "ওহে পরমপিতা পরমাত্মা তুমি এবার এসো"। তিনি সর্বব্যাপী হলে, ওনাকে তো ডাকার প্রয়োজনই নেই। তাই এখন আপনাদের খুব সুন্দর পরামর্শ দিচ্ছি শুনুন, যা ব্রহ্মার উপদেশ। যে ব্রহ্মার এই হিতোপদেশ খুবই বিখ্যাত জগতে। আমরা সেই ব্রহ্মারই মুখ-বংশাবলী দত্তক সন্তান ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীরা। সেই ব্রহ্মাকে আবার যিনি সদুপদেশ দিয়ে থাকেন, তিনি অবশ্যই অতি উচ্চ হবেন। (তিনি নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা) ব্রহ্মা সেই পরমপিতা পরমাত্মা শিবেরই পুত্র। যিনি সব আত্মারই পিতা। আর ইনি (সাকার ব্রহ্মা) হলেন প্রজাপিতা, সাকার মানুষদের পিতা। বাচ্চারা, তোমরা যদি এমন ধরণের জ্ঞানগুলির বিচার-সাগর মন্থন করে সেবা করতে পারো, তবে তোমরাও খুব আনন্দ পাবে তাতে। যে কেউ তোমার সামনে আসবে, তাকেই এমন সব জ্ঞান-রত্নের উপহার দেবে। যেখানে এই বাবা এসে বাচ্চাদেরকে নানা প্রকারের জ্ঞান-রত্ন চয়ন করান, যার দ্বারা তোমরা বিশ্বের মালিকে পরিণত হও, সেখানে রাবণ এসে তোমাদেরকে হানিকারক ফল- 'কুল' খাওয়া শেখায়।

শিবের বা অন্যান্য দেব-দেবীর চিত্র ও মূর্তি, সেগুলি তৈরী করা হয় পাথরের। আর এই পাথরকে পূজো করতে করতে জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরাও এমন পাথর-বুদ্ধির অর্থাৎ নির্বোধে পরিণত হয়েছে। এমন কি বাস্তবে যিনি বিচিত্র অর্থাৎ নিরাকার শিব, তাকেও পাথরের বানিয়ে রেখেছে। এই চৈতন্যরূপী শিববাবাই বিশেষ কোনও সময়কালে অবশ্যই ধরায় আসেন তার চৈতন্যরূপী আত্মাধারী বাচ্চাদেরকে জ্ঞানের পাঠ পড়াতে। আর সেই বিশেষ সময়ে সাকার ব্রহ্মার উপস্থিতিও অবশ্যই থাকবে। ব্রহ্মার প্রধান সহযোগী ব্রহ্মাকুমারী সরস্বতীও থাকবে নিশ্চয়। বাস্তবে তারা এখন এই সময়ে উপস্থিত এখানেই। সরস্বতীর মহিমা-কীর্তনে তো বলাই আছে, উনি সবারই মনোকামনা পূর্ণ করেন। অবিনাশী জ্ঞান-রত্ন প্রদানকারী জ্ঞানের-দেবী বা গডেজ্ অফ নলেজ। তাই তো শাস্ত্রকারেরা সরস্বতীর হাতে বীণা-বাদ্যযন্ত্রও দিয়েছে। এইসব পয়েন্টগুলিও বুদ্ধিতে ধারণ করে তার প্রয়োগ করতে হবে। যে ভাষণ করবে, তাকে অবশ্যই এই পয়েন্টগুলির বিচার-সাগর মন্থন করতেই হবে। প্রথমে সাধারণ ভাবে তা লিখে নিয়ে পরে তারও সূক্ষ্ম পয়েন্ট-গুলিকে মন্থন করতে হবে মনের গভীরে। বড়-বড় বিখ্যাত ভাষণকারীরা খুব সতর্কতার সাথে ভাষণ করে। তাদের সেই ভাষণ পয়েন্ট অনুযায়ী একেবারে সঠিকও হয়। ভাষণ করার সময় একটুও আটকে গেলো তো, তখন মান-সন্মান সব ধূলোয় মিটিয়ে গেল। তাই তো ভাষণকারীরা এ বিষয়ে আগে-ভাগেই বাড়ীতে খুব ভালভাবে অভ্যাস করে নেয়। সাথে একথাও যথেষ্ট মনে রাখতে হবে যে, কত সুন্দর ভাবে লোকেদের কাছে বাবার পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। যেহেতু সেবা তো তোমাদের করতেই হবে। যেখানে এত-এত লোকেরা বিকারী গুরুদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে আছে। যদিও সেইসব গুরু-গোঁসাইরা সদগতি করতে পারে না কারওকেই। পতিত-পাবন নিরাকার একমাত্র ভগনানকেই বলা হয়। তিনি সর্বব্যাপী এই জ্ঞান পোষণ করায়, (তাতে ওনার গ্লানি হওয়ায়) আজ পর্যন্ত কারও সদগতি হয়নি। পতিত-পাবন তো কেবলমাত্র এক ও একমাত্র শিববাবা। যাকে রুদ্র-ও বলা হয়ে থাকে। এই রুদ্র-যজ্ঞই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ জগতে। এত বিশাল-বড় যজ্ঞের রচনা আর কারও দ্বারাই করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই রুদ্র-জ্ঞান যজ্ঞ কত বছর ধরে চলে ? -- যতদিন ধরে এই জ্ঞানের পাঠ চলতেই থাকবে, ততদিন। জাগতিক যজ্ঞের অনুষ্ঠানে লোকেরা নানা প্রকার শাস্ত্রের উপযোগ করে। সেখানে রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবদগীতা, ইত্যাদি পাঠ করে শোনায়। অজ্ঞানী লোকেরা তাকেই রুদ্র-যজ্ঞ বলে থাকে। বাস্তবে তোমাদের এই যজ্ঞই হলো রুদ্র যজ্ঞ - যা লাগাতর বহু সময়, অনেক বছর ধরে চলতেই থাকে। আর জাগতিক

লোকেদের রুদ্র-যজ্ঞ খুব বেশী হলে মাসাবধি চলতে পারে। আর দেখো, তোমাদের এই যজ্ঞ কতদিন কত বছর ধরে চলে আসছে। ফলে পুরোনো যা কিছু ময়লা-আবর্জনা সে সবের বিনাশও হয়ে যায়। এমন কি সমগ্র পুরোনো দুনিয়ায় যা কিছুই আছে, তা সবই ভষ্মীভূত হয়ে যায়। এবার আন্দাজ করো - কত বিশাল এই রুদ্র-যজ্ঞ। সব শরীরধারীর নশ্বর-দেহ এই যজ্ঞে স্বাহা হয়ে ভষ্মে পরিণত হলে, তবেই তো সব আত্মারা পরমধাম ফিরে যেতে পারবে।

যতক্ষণ না বাবা আসে, ততদিন পর্যন্ত তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হতে পার না। (উনি ছাড়া) মায়ার এই শৃঙ্খল থেকে মুক্তই বা কে করবে ? আর তেমন কারওকে তো অবশ্যই দরকার। তাই তো মালিক (ভগবান) স্বয়ং আসেন এখানে। এমনটা মোটেই সম্ভব নয়, উনি সর্বব্যাপী বসেই এই জ্ঞানের পাঠ পড়াবেন। উনি স্বয়ং এখানে এই দুনিয়ায় আসেন। আমরা ওনারই সন্তান এবং নাতি-নাতিনীও। বাস্তবে যা তোমরা বি.কে.-রা। সেই বাবাই এখন এখানে এসে স্বয়ং ওনার নিজের পরিচয় জানাচ্ছেন। সাথে সাথে স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনা কার্যও চলছে। বাচ্চারা, তোমরা বি.কে.-রা হলে রাজ-যোগের ঋষি, আর অন্যেরা হঠ্-যোগের ঋষি। এ নিয়ে তারা আবার আলোচনাও করে, হঠ্ যোগের ঋষিদের গুরত্ব বেশী না কি রাজ যোগের ঋষিদের। এসব কেবলই অজ্ঞানী ভক্তি-মার্গের আলোচনা মাত্র, কিন্তু তোমাদের পথ তো জ্ঞান-মার্গের। এই ভক্তি আর জ্ঞানের পরিমাপের দাঁড়ি-পাল্লার কিছু গল্প-গাঁথাও আছে। দুনিয়ার যাবতীয় পুঁথি-শাস্ত্র একদিকে আর অন্যদিকে কেবলমাত্র একটি গীতা। তাতে দেখা যায় যে গীতার দিকটাই ভারী হয়ে গেছে। এই গীতার জ্ঞানেই জ্ঞানী রাজ-ঋষিরা, যেখানে হঠ্-যোগীদের কত অনেক শাস্ত্রের সমাহার। একদিকে ওদের যাবতীয় সবকিছুকে রাখো আর অপরদিকে কেবল গীতাকে রাখো। যদিও বাস্তবে, ঐ গীতা ব্রহ্মাকুমারীসের নয়। তোমাদের গীতা হলো জ্ঞান। আর এই গীতার ভগবান স্বয়ং আসেন তোমাদের সদগতি করতে। অতএব বাচ্চারা, তোমাদের মন ও বুদ্ধিতে এসব অবশ্যই থাকা দরকার। কেউ বুঝতে পারল বা না পারল - প্রত্যেক এক একজনের দায় কিন্তু তোমার উপরেই বর্তাবে। যেহেতু তা বোঝানোর দ্বায়িত্ব তোমার। মৃত্যুর আগে তো সবারই তখন সেই দৃষ্টি আসে। এই জ্ঞান-যজ্ঞের বহ্নিশিখা থেকেই সেই বিনাশের জ্বালামুখীর সৃষ্টি। তোমাদের অর্থাৎ পাণ্ডব বাচ্চাদের প্রভু পরমপিতা পরমাত্মা। পতিতদের পবিত্র বানাবার কারিগর এক ও একমাত্র পরমাত্মা, কৃষ্ণ অবশ্যই নয়। কৃষ্ণ তো কত ছোট রাজকুমার। তাকে তো কেউ গড্-ফাদার বা ঈশ্বরীয় পিতা বলে না। সন্তান-সন্ততি হলে তবেই তো তাকে বাবা বলা হয়। যেখানে কৃষ্ণ নিজেই একজন বাচ্চা, সেক্ষেত্রে ওনাকে বাবা বলবই বা কি প্রকারে ? জাগতিক নিয়মে কিন্তু তা বলে না। কৃষ্ণের আবার সাথীরও প্রয়োজন। তাদের দুজনের বাচ্চা হলে তবেই তো কৃষ্ণকে বাবা বলা যাবে। আর তখন আবার ঘর-গৃহস্থীর ব্যাপার এসে দাঁড়াবে। কিন্তু এখানে তো নিরাকার বাবা স্বয়ং বাচ্চাদেরকে সামনে বসিয়ে জ্ঞানের পাঠ পড়ান। তা গৃহস্থ ব্যবহারের মধ্যে পড়ে না, যিনি সদা-কালের পবিত্র। কৃষ্ণ যেখানে মাতার গর্ভে জন্ম নেয়, তাই তাকে তো আর পতিত-পাবন বলা যায় না।

বাচ্চারা, তোমরা এখন জানতে পেরেছো, নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মাকে তো এই ব্রহ্মার শরীরেই অবস্থান করতে হবে। অতএব প্রজাপতির সাকারী শরীরও থাকতে হবে সেই সময়কালে। আর এই কারণেই ওনার নাম ব্রহ্মা, যার সাধারণ শরীরে প্রবেশ করেন নিরাকার শিববাবা। ৮৪ জন্ম কর্মভোগের পর এটাই ব্রহ্মার আত্মার জন্মের অন্তিম জন্ম, আর বর্তমান সময়ে ওনার এখন বানপ্রস্থ অবস্থা - অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে অনুভবী রথ (শরীর)! কথিত আছে অর্জুন অনেককেই গুরু

বানিয়ে, নানাবিধ শাস্ত্রাদি অধ্যায়ন করে অনেক জ্ঞানও অর্জন করেছিল। তোমরাও অন্যদের এভাবে বোঝাতে পারো। প্রজাপিতা ব্রহ্মার নাম কি তারা শুনেছে কখনও ? আর ব্রহ্মা যদি থেকে থাকে তবে ব্রাহ্মণদের অস্তিত্বও অবশ্যই থাকবে। এই বর্ণ বা বংশ-কুলটাই প্রধান বিষয়। সৃষ্টি-চক্রেও এই বর্ণের উল্লেখ থাকে। এই কুলগুলির মধ্যে ব্রাহ্মণ-কুলই সংখ্যায় সবচেয়ে ছোট কুল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ব্রাহ্মণদেরকে জ্ঞান ধারণ করতে হয়। সংখ্যায়ও তারা যথেষ্ট কম থাকে। ব্রাহ্মণদের থেকে দেবতাদের সংখ্যা থাকে কিছু বেশী। তার থেকে বেশী থাকে ক্ষত্রিয়, তারও বেশী বৈশ্য, আর সবচেয়ে বেশী শূদ্র। অতএব এবার বোঝো, তোমরা ব্রাহ্মণেরা সংখ্যায় কত কম। সেই কম সংখ্যার মধ্যেও আবার অনেক কম ব্রাহ্মণই আছো যাদের খুশীর পারদ সর্বদাই উর্দ্ধগতিতে। এ বিষয়ে বাবা জানাচ্ছেন, খুশীর পারদ উর্দ্ধগতি হয়, অমৃতবেলার যোগ-অভ্যাসে। দিন ও রাতের বায়ুমণ্ডল তো তেমন শুদ্ধ থাকে না। তাই তা যোগের সহায়কও হয় না। আর এই কারণেই অমৃত-বেলার এত মাহাত্ম্য। সেই সময়ে পরিশ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লে আত্মারা শরীরের সম্পর্ক থেকে নিরাসক্ত ও স্বতন্ত্র থাকে। যা খুবই শুভ-মুহূর্ত। বস্তুতঃ, সব সময়েই চলতে-ফিরতে, কর্ম-কর্তব্য করতে করতেই বাবাকে স্মরণ করতে হবে। কিন্তু হঠাৎ করে এক জায়গায় বসে পড়ে বাবাকে স্মরণ করতে লাগলাম, সেই স্মরণ স্থায়ী বা যোগযুক্ত হয় না। ঋষি-মুনি ও ভক্ত লোকেরাও অমৃতবেলায় উঠে মন্ত্র পাঠ ও কীর্তন ইত্যাদি করে। যেহেতু সেই সময়ে বায়ুমণ্ডল শুদ্ধ থাকে। তাই সে সময়ে কেউ যদি তোমার কাছে আসে, তাকে বলতে হবে, এখন আমার জ্ঞান-পাঠের সময়। এটা কোনও অন্ধশ্রদ্ধার ব্যাপার নয়। এখন নিরাকার বাবা শিক্ষক রূপে আমাদের সহজ রাজযোগ শেখাচ্ছেন। মানুষেরা তাতে হতভম্ব ও আশ্চর্য হয়ে যাবে, যিনি নিরাকার তিনি আবার পড়াবেন কিভাবে। কিন্তু ভগবানের একথাও তো সত্য, তাই উনি অবশ্যই শরীরে প্রবেশ করে রাজযোগ শিখেয়ে থাকেন। তখন তিনি সেই শরীরের আধারকে ভাড়া (ভর) করেন। তাই, সর্বাগ্রে যথেষ্ট যুক্তি-যুক্ত ভাবে বাবার পরিচয় জানাতে হবে। সর্বব্যাপী বললে তো আর আশীর্বাদী বর্ষা পাওয়া যায় না। যতক্ষণ না পর্যন্ত ভগবানের মহাবাক্য কানে ঢুকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ তাকে বুঝতে পারে না।

ভগবান হলেন নিরাকার, ব্রহ্মা হলেন সাকার প্রজাপিতা, আর তোমরা বি.কে.-রা হচ্ছো ব্রহ্মাকুমার ও ব্রহ্মাকুমারী। নিরাকার পরমাত্মা ব্রহ্মার শরীরে এসে অবস্থান করে তোমাদেরকে এই জ্ঞানের পাঠ পড়ান। তোমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার। যতক্ষণ তোমরা বাবার পরিচয় দিতে থাকবে, ততক্ষণ বাবাও স্মরণে থাকবে। (ফর্মে) যারা যারা লিখবে বাবা নিরাকার, তাদেরকে অবশ্যই ভাল করে বোঝাতে হবে। আবার যারা যারা লেখে, এসবের কিছুই জানি না,- তাদেরকে বলতে হবে, আরে তোমরা তোমাদের প্রকৃত পিতাকেই জানো না ? তাকে পরমপিতা-পরমাত্মা বল যেখানে, তবে তো ওনার কোনও অস্তিত্ব অবশ্যই আছে, কেউ না কেউ তো হবেনই তিনি। বাচ্চারা, তোমরা তো জানো, তোমাদের আগামী ভবিষ্যতের জন্ম-জন্মান্তরের আজীবিকা যা কিছু প্রাপ্তি হয়, তা এই পরমপিতা-পরমাত্মার কাছ থেকেই। আর এতে যারা বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তাদের মাথায় বিশাল পাপের বোঝা চাপে। এতসব জেনেও অনেকেই ইচ্ছাকৃত ভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। কিন্তু যারা তা জানে না, তাদের অবশ্য কোনও দোষ হয় না। হিসেব করে দেখতে গেলে বর্তমানের গোটা দুনিয়াটাই তো অবুঝের। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ ও ভালবাসা ..... এর প্রতিটি অক্ষরের অর্থ তোমরা নিশ্চয় জানো বাচ্চারা। সর্বাগ্রে মাতা-পিতা, তারপরে বাপদাদা। মাতা-পিতা

তাকেই বলা যায়, যে সন্তানকে স্বর্গ-রাজ্যের মালিক করে গড়ে তোলে। এই দুয়ের পরে আসে বাপদাদা, এরও পরে আসে জগদম্বা। এসব অতি সূক্ষ্ম ও গুহ্য ব্যাপার। প্রথম গুহ্য রহস্যের হেঁয়ালি কথাটি - যা বুঝতে পারলে মানুষ খুবই লাভবান হয়। এরও পরে সিকিলধে অর্থাৎ হারানিধি - (বহুদিনের হারিয়ে যাওয়াকে খুঁজে পাওয়া) -যা কিনা দ্বিতীয় রহস্যের হেঁয়ালি। এরপর আসে ব্রাহ্মণ কুল-ভূষণ, স্বদর্শন চক্রধারী- এটাও একটা নতুন রহস্যের হেঁয়ালি। প্রত্যেকটি অক্ষরের মধ্যেই এমনই হেঁয়ালি লুকিয়ে আছে।..... আচ্ছা !

স্বদর্শন চক্রধারী, চোখের তারার মণির মতন রত্নধারী বাচ্চাদের প্রতি স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) অমৃতবেলার শুভ মুহূর্তে খুব প্রেম-পূর্বক বাবাকে অনেক অনেক ভালবেসে স্মরণ করে খুশীর পারদকে বাড়াতে হবে। চলতে-ফিরতেও স্মরণে থাকার অভ্যাস করতে হবে।

২) পাপ কর্ম এড়ানোর জন্য কিম্বা জ্ঞানকে খুব ভালভাবে ধারণ করার নিমিত্তে এক ও একমাত্র বাবার সাথে বুদ্ধিযোগে যোগযুক্ত হবার পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদান :- সন্তুষ্ট থেকে এবং সবাইকে সন্তুষ্ট করে শুভ ভাবনা আর শুভ কামনা সম্পন্ন হও

বিস্তার :- ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যে নিজে সদা সন্তুষ্ট থাকে এবং সবাইকে সন্তুষ্ট করে, তা যা কিছুতেই হোক না কেন, কেউ যতই তা থেকে বিচ্যুত করাতে চায় না কেন, কিন্তু তাতেও সতর্ক ভাবে নিজেকে সন্তুষ্ট রেখে অপরকেও সন্তুষ্ট করতে হবে। এই স্মৃতি স্মরণে থাকলে কখনই ক্রোধ আসবে না। এমন কি যদি কেউ বার বার ভুলও করে, তবুও তাকে পরিবর্তন করার জন্য ক্রোধ করবে না। বরং দয়াবান হয়ে শুভ ভাবনা, শুভ কামনার দৃষ্টি রাখলে সহজেই সে পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

স্লোগান :- পরমাত্ম প্রেমের অনুভবী হতে পারলে কোনও বাধাই তোমাকে আটকাতে পারবে না।